Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
Impact Factor: 6.28 (Index Copernicus International)
Volume-XIV, Issue-II, January 2026, Page No. 175-184
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Sribhumi, Assam, India
Website: http://www.thecho.in
DOI: 10.64031/pratidhwanitheecho.vol.14.issue.02W.062

বিশ্বায়নের যুগে বিজ্ঞাপন ও ভোগবাদী চেতনার নির্মাণ: নির্বাচিত বাংলা ছোটোগল্পের দর্পণে

আদিত্য চক্রবর্তী, *গবেষক, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারতবর্ষ*

Received: 21.01.2026; Accepted: 26.01.2026; Available online: 31.01.2026
©2026 The Author(s). Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Sribhumi. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

This paper undertakes a critical literary examination of advertising as a cultural and ideological apparatus within the socio-economic context of globalization, with particular reference to selected Bengali short stories written from the late twentieth century onwards. Rather than approaching advertising as a neutral or purely commercial phenomenon, the study conceptualizes it as an active agent of neoliberal capitalism that reshapes subjectivity, desire, social relations, and everyday life. The advent of economic liberalization in India in the early 1990s marked a decisive shift in market dynamics, facilitating the aggressive entry of corporate capital and consumer culture into the private and psychological domains of individuals.

The paper further explores how language itself becomes a site of ideological intervention, as everyday speech is increasingly infiltrated by brand names, slogans, and hybrid linguistic forms. Television and visual media function as crucial mediators in this process, producing a culture of endless desire and emotional detachment. Individuals are gradually reduced to consumers and, ultimately, to marketable entities within a commodified social order.

Bengali short fiction, as examined in this study, emerges as a critical space that exposes the contradictions of globalization and the psychological dislocations produced by consumer capitalism. While these narratives do not offer solutions or redemptive alternatives, they articulate a sustained intellectual discomfort that challenges the seductive certainties of advertising discourse. The paper argues that such literary representations are essential for understanding the cultural consequences of neoliberal globalization and the subtle mechanisms through which advertising exercises power over contemporary life.

Keywords: Globalization, Advertising Ideology, Neoliberal Capitalism, Bengali Short Fiction, Hyperreality, Cultural Hegemony

(১)

"অতি বিজ্ঞাপিত জিনিসের প্রতি আমার শ্রদ্ধা অতি কম। কারণ, মানব-হৃদয়ের স্বাভাবিক দুর্বলতার উপর বিজ্ঞাপনের বল এবং মানবমনের সরল বিশ্বাসের উপর বিজ্ঞাপনের ছল প্রতিষ্ঠিত"[১] – প্রমথ চৌধুরীর বিখ্যাত 'মলাট সমালোচনা' প্রবন্ধের এই উচ্চারণের প্রেক্ষিত, প্রসঙ্গ ভিন্ন হলেও পণ্য সংস্কৃতির বিস্তারণের সহযোগের মধ্য দিয়ে বিজ্ঞাপনের ব্যাপ্তি এবং মানবচেতনার আরশিতে তার তেজঃপ্রভা বিকিরণে যে রূপ প্রকাশিত হয়েছে, বিশ্বায়নের হস্ততলগত ভার্চুয়াল রিয়েলিটিতে আপনার অস্তিত্বের সংকটের লগ্নে এই বিজ্ঞাপনের এই 'অতিরিক্ত' প্রসার কীভাবে আমাদের অতি রিক্ত করে; পণ্যের আকর্ষণীয় পরিচয় নির্মাণ করে ব্যবসায়িক বুদ্ধিজাত বিজ্ঞাপন আমাদের জীবন ও চেতনার সাথে মিশে আগ্রাসী পুঁজি সংস্কৃতির অস্ত্র হয়ে যাপন অভিমুখকে নির্দিষ্ট করে,

আমাদের ভালো থাকার ইচ্ছেকে ভালো থাকার প্রতিযোগিতায় পর্যবসিত করে— এ সকল বিষয়ের মনোযোগী ও তন্বিষ্ট অনুধ্যান আমাদের যাপনপ্রণালীর অন্তর্লীন বহু নেপথ্য সত্যকে প্রকাশিত করতে পারে।

(২)

আধুনিক বিপণনের শক্তিশালী হাতিয়ার, আধুনিক জীবনযাত্রার অঙ্গ হিসাবেই বিজ্ঞাপনকে গণ্য করা হয়। যদিও তার আদি উৎস বলা যায় বেশ প্রাচীন। ব্রিটিশ মিউজিয়ামে সংরক্ষিত প্যাপিরাসে এক মিশরীয় পলাতক ক্রীতদাসের বিজ্ঞাপন দেখা যায়। যদিও তা খানিক আজকের যুগের বিজ্ঞপ্তিরই আকারে। তবুও লিখিত বিজ্ঞাপনের প্রাচীনতম নিদর্শন বলা যেতে পারে আনুমানিক তিন হাজার বছর আগের এই বিজ্ঞাপনকেই।

বিজ্ঞাপনের পরবর্তী নিদর্শন খ্রীস্টপূর্ব এক হাজার বছর আগের ইতালির পম্পেই শহরের প্রত্নতাত্ত্বিক খননের দ্বারা প্রাপ্ত। যেখানে নানারকম প্রতীকে স্নানঘর, সরাইখানা বা ডেয়ারির দোকানকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। আধুনিক জীবনেও এই প্রতীকের ব্যবহার আজও প্রচলিত, বলা যায় এগুলিই ছিল তার প্রাচীন রূপ।

এরপর জার্মানিতে ১৪৩৮ এ গুটেনবার্গের মুভেবল টাইপ বা ছাঁচে ঢালা ছাপা হরফের উদ্ভাবন, তারও ত্রিশ বছর পর উইলিয়াম ক্যাক্সটনের মুদ্রণযন্ত্র, বই এর প্রচারের জন্য পাঁচ ইঞ্চি চওড়া, সাত ইঞ্চি লম্বা হ্যাণ্ডবিল ছাপানো, এরপর ইউরোপে সপ্তদশ শতাব্দী থেকে মুদ্রিত পত্রিকার প্রচলন বিজ্ঞাপনের এক শক্তিশালী প্রকাশ মাধ্যম হয়ে ওঠে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য,অনেক ঐতিহাসিকের মতে সংবাদপত্রে প্রকাশিত প্রথম বিজ্ঞাপিত বস্তুটি হলো একটি বই। যা ১৬২৫ খ্রিস্টাব্দে 'মারকিউরাস ব্রিটানিকাস' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।[২] আরো শতবর্ষ পরে অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইউরোপে শিল্পবিপ্লবের ফলে উৎপাদন, পরিবহন এবং বিপণন ব্যবস্থায় ব্যাপক বদল আসে। তেমনভাবেই বিজ্ঞাপনও কেবল পণ্যের জ্ঞাপনেই সীমাবদ্ধ না থেকে শুরু হয় বিজ্ঞাপনকে কেন্দ্র করে শৈল্পিক চিন্তা। দেশ কাল সময় ভেদে আসতে থাকে বহু বৈচিত্র্য। যেমন ইংল্যাণ্ড বা ফ্রান্সের বিজ্ঞাপন ছিল আলংকারিক, জমকালো আবার অন্যদিকে আমেরিকার বিজ্ঞাপনে পেশাদারিত্ব ছিল অধিক।

গোলাম মুরশিদ, ১৭৮০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৮০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে প্রায় দুই হাজারের অধিক বাংলা বিজ্ঞাপন সংগ্রহ করেছেন। এগুলি প্রকাশিত হয়েছে জেমস অগাস্টান হিকির 'দ্য বেঙ্গল গেজেট' থেকে। উল্লেখযোগ্য, যার অপর নামই ছিল 'ক্যালকাটা জেনারেল আডভাইজার'। পত্রিকাটির দুটি পৃষ্ঠার বেশিরভাগ জায়গা জুড়ে থাকতো বিজ্ঞাপন, যা ছিল ইউরোপীয় পত্রিকারই আদলে। এই ইংরেজি পত্রিকাতেও বিপুল পরিমাণে বাংলা বিজ্ঞাপনের কারণ হিসাবে গোলাম মুরশিদ অনুমান করেছেন,

> "আমার ধারণা, মুসলিম শাসন-আমলের রাজভাষার প্রতি নতুন শাসকদের কোনো প্রেম ছিলো না। বরং এই ভাষা ধীরে ধীরে কিভাবে মুছে ফেলা যায়, কম্পানির শাসকরা সেই পন্থা সম্পর্কেই চিন্তাভাবনা করছিলেন। শাসনযন্ত্র চালিয়ে নেবার জন্যে যতোটুকু ফারসির প্রয়োজন, তাঁরা ততোটুকু ফারসিই ব্যবহার করতে তৈরি ছিলেন। কিন্তু দেশীয় ভাষার ব্যবহার বন্ধ করে রাতারাতি ইংরেজির প্রচলন সম্ভব অথবা বাঞ্ছিত ছিলো না, হয়তো সেজন্যেই, ঔপনিবেশিক শাসকরা ফারসির পরিবর্তে বাংলা ভাষার প্রতি পৃষ্ঠপোষকতা পৃষ্ঠপোষণা দেখাতে আরম্ভ করেন। তাঁরা এই পৃষ্ঠপোষণার মাধ্যমেই সম্ভবত বাংলাকে ফারসির বিকল্প হিশেবে খাড়া করতে চেয়েছিলেন।"[৩]

(৩)

বিজ্ঞাপনের বিবর্তনের সুদীর্ঘ ইতিহাস আমাদের অভিসন্দর্ভ বিষয় নয়। কিন্তু এটুকু বলা যায় যে বিজ্ঞাপনের বিবর্তন আমাদের আর্থ সামাজিক রাজনৈতিক প্রবাহকে চিনতে সহায়ক হয়ে ওঠে। তার ভাষা, চিত্র, প্রতীক

যেহেতু সমাজ মনে প্রমুখনের উদ্দেশেই নির্মিত তাই সমাজ ইতিহাসের দলিল হয়ে উঠতে পারে এই বিজ্ঞাপন মাধ্যমটি। তারই মধ্যে আমরা আমাদের আলোচনাকে সীমিত রেখেছি এমন একটি নির্দিষ্ট কালপর্বে, যার যুগধর্মই রচিত হয়েছে পণ্য ভাষায়। একদিকে প্রযুক্তির ব্যাপক পরিবর্তন, অন্যদিকে বিদেশি পণ্যের অবাধ অনুপ্রবেশ প্রতিনিয়ত বদলে দিয়েছে আমাদের পারিপার্শ্বিক আবহকে। এই বিবর্তন আকস্মিক বা একমাত্রিক নয়, মানবচেতনায় তার প্রভাবও বহুমাত্রিকতায় পূর্ণ। আমরা আমাদের আলোচনাকে তাই নিবিষ্ট করেছি বিশ্বায়ন কালপর্বের সূচনালগ্ন থেকে বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষ কর্পোরেট বার্তা এবং আমাদের ব্যক্তিক ও সামাজিক জীবনের যাপন-বিকাশের মধ্যবর্তিতায় তার প্রভাবকে কীভাবে জীবন অভিজ্ঞতার সৃজন-প্রতিভার মাধ্যমে বাংলা ছোটোগল্পে প্রতিফলিত হয়েছে তার মধ্যে।

মূল আলোচনায় অনুপ্রবেশের পূর্বে ক'একটি সূত্রে সময়ের প্রবাহকে আমরা একটু বুঝে নিতে চেষ্টা করতে পারি।

এক, প্রবল 'ইন্দিরা-হাওয়া'কে কাজে লাগিয়ে বিপুল সংখ্যাধিক্য নিয়ে ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দে রাজীব গান্ধীর প্রধানমন্ত্রীত্বে আসা সরকার সোভিয়েত ইউনিয়ন নির্ভরতার আচ্ছন্নতা থেকে বেরিয়ে অর্থনৈতিক সংস্কারের প্রতি অগ্রসর হয়। ১৯৮৫ সাল থেকে আমদানি শুল্ক হ্রাস, বাণিজ্যের বিধিসমূহের উপর শিথিলতা আসতে থাকে। রিলায়েন্স কোম্পানির ব্যবসা এই সময় থেকেই এক স্বপ্নের উড়ানদৌড় শুরু করে।

দুই, ১৯৯০ সালে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি থেকে পোল্যান্ড সরে আসে। একদলীয় শাসন থেকে বহুদলীয় নির্বাচনের ঘোষণা করে সোভিয়েত ইউনিয়ন। সংবিধান সংশোধনের মধ্য দিয়ে সোভিয়েত এর প্রথম রাষ্ট্রপতি হন মিখাইল গর্ভাচেভ। একই বছর শীতলযুদ্ধের পরিসমাপ্তির জন্য শান্তিতে নোবেল পেলেন গর্ভাচেভ। সোভিয়েতে খুললো পিৎজা হাট, ম্যাকডোনাল্ডের বিপণি। ১৯৯১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে পড়ে। চেকস্লোভাকিয়া, হাঙ্গেরি এবং পোল্যান্ড মুক্তবাজার অর্থনীতিকে গ্রহণ করে। রাশিয়ার নতুন রাষ্ট্রপতি হন বরিস ইয়েলেৎসিন। সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ হয়, গৃহবন্দি করা হয় মিখাইল গর্ভাচেভকে। কুয়েতের তেল খনিগুলির দখল নিয়ে আমেরিকা ও ইরাকের মধ্যে চলে 'উপসাগরীয় যুদ্ধ', যার প্রভাবে প্রেট্রোপণ্যের মূল্যের অভাবনীয় বৃদ্ধি হয়।

তিন, ১৯৯১ সালের সূচনায় ভারতের অর্থনীতি অব্যবস্থার চূড়ান্তে পৌঁছে যায়। বিদেশি মুদ্রার সঞ্চয় নেমে আসে তলানিতে। বিশ্বব্যাঙ্ক ভারতকে ঋণ দিতে অস্বীকৃত হয়। এই অবস্থায় দাঁড়িয়ে ১৯৯১ সালের ২৪শে জুলাই তারিখে নরসিমা রাও মন্ত্রীসভার অর্থমন্ত্রী ড: মনমোহন সিং যে বাজেট পেশ করেন তা ভারতের আর্থ সামাজিক ইতিহাসকে সম্পূর্ণ রূপে বদলে দেয়। 'লাইসেন্স রাজ' এর বিলোপ সাধন, নানাক্ষেত্রে বিদেশি বিনিয়োগ বাড়িয়ে ৫১% করে দেওয়ার মতো অভাবনীয় কিছু পদক্ষেপ আগামী দিনে বদলে দেয় ভারতের অর্থনীতি, রাজনীতি ও সমাজবোধ। বৈদেশিক পুঁজির প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে বৈদেশিক সংস্কৃতির ব্যাপক প্রসার, সীমাহীন ভোগবাদ আমাদের যাপনচিত্রকে এক ভিন্ন অভিমুখে চালনা করতে থাকে।

একদিকে অর্থনৈতিক বিপর্যয়, অন্যদিকে তা থেকে পুনরুজ্জীবিত হওয়ার পথ হিসাবে উদার অর্থনীতির এই ঘোষণা দেশজুড়ে অর্থনীতি মহলে প্রবল বিতর্ক সৃষ্টি করে। কারুর মতে, এটি অর্থনীতির পক্ষে ক্ষতিকর অন্যদিকে নীতি প্রনয়ণকারী সরকারেরও বক্তব্যে ছিল প্রচুর অস্পষ্টতা। ১৯৯৩ সালে 'দেশ' পত্রিকায় অনির্বাণ চট্টোপাধ্যায় এ প্রসঙ্গে বলেন—

> "বেতার এবং দুরদর্শনের মতো দুটি গণমাধ্যম সরকারের হাতে, রাজনীতির লড়াইয়ে সে দুটিকে ব্যবহার এবং অপব্যবহার করার অভ্যাস ক্ষমতাসীন রাজনীতিকদের বিলক্ষণ আছে, কিন্তু অর্থনীতির মামলায় আত্মপক্ষ সমর্থনে তাঁদের একেবারেই ব্যবহার করতে পারেননি

> সরকার। হয়তো করতে চাননি, পাছে বিরোধীরা তা নিয়ে আরও শোরগোল করেন। কিংবা হয়তো সরকার ভাবছেন, আলাদা করে অর্থনৈতিক সংস্কারের গুণগানের প্রয়োজন নেই, দূরদর্শনের পর্দায় বিজ্ঞাপনের কড়া আলোয় আর চড়া রঙে দেশি-বিদেশি ভোগ্যপণ্যের যে অনন্ত মহাবিশ্ব মুগ্ধ দর্শকদের সামনে উদ্ভাসিত হচ্ছে, সেটাই উদারনীতির মোক্ষম সার্টিফিকেট। হয়তো খুব ভুল ভাবনা নয় দৈনন্দিন জীবনের সহস্র যন্ত্রণা আর অনিশ্চয়তার শিকার যে-গড়পড়তা দূরদর্শক, তাঁর কাছে বিজ্ঞাপনের এই জগৎ একটা মরীচিকার মতো। সেই জগতে পাহাড় থেকে নেমে আসে ঘন দুধের উত্তাল ঝরনা, সমস্ত নারীর ত্বক মসৃণ, সেখানে মোটরগাড়িরা বাজনার তালে তালে যুগলে নাচে। তৃষ্ণার্ত দর্শকের ঘোর লাগতেই পারে। এমন কি, যে দর্শক সচেতন যুক্তিবাদী, তিনিও ভাবতে পারেন-কোথাও একটা মরূদ্যান নিশ্চয়ই আছে, তা না হলে মরীচিকা দেখা যেত না, মরীচিকা তো মরুদ্যানেরই প্রতিরূপ।"[৪]

এই বক্তব্যের অংশ থেকে এটুকু সুস্পষ্ট অনুমান করা যায় যে বিজ্ঞাপনের জগৎ এই সময় পর্ব থেকে জনমানসে ক্রমশ কী মাত্রায় প্রভাব বিস্তার করেছে। প্রসঙ্গত স্মরণ করা যায়, স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই 'নিউ ইণ্ডিয়া এসিওরেন্স' কোম্পানির একটি বিজ্ঞাপনের কথা, যেখানে শিরোনামে বড় বড় অক্ষরে লেখা হয় "মালিকের ফ্ল্যাটে ছাঁটাই হওয়া শ্রমিকের হামলা! ১১,৬০০ টাকা ডাকাতি।" তারপরেই কোম্পানি প্রশ্ন ছুঁড়ে দেয় "যতটা নিশ্চিত আপনি ততটাই কি নিরাপদ?" অর্থাৎ ছাঁটাই হওয়া, জীবন সংকটের মুখোমুখি হওয়া 'শ্রমিক' এখানে 'ডাকাত' এবং এখানে বিজ্ঞাপন যেন মালিকপক্ষের প্রতিনিধিত্ব করছে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, দেশভাগ সহ একাধিক বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে সদ্য স্বাধীন হওয়া দেশে সীমাহীন সমস্যার সময়ে এই বিজ্ঞাপনের সময়ের চার সাড়ে চার দশক অতিক্রমণের পরে গৃহীত নীতি পুঁজিবাদকে যে আরো পোক্ত করেছে এবং করবে তাই ই অনুমেয়। তাই এই একুশ শতকের গোড়ায় যখন একাধিক বৈজ্ঞানিক গবেষণায় বেশ কিছু ঠাণ্ডা পানীয় মানবদেহের পক্ষে ক্ষতিকর বিষ রূপে চিহ্নিত হয়, তখন সেই ল্যাবরেটরি Test কে ঠাণ্ডা কোম্পানীর বিজ্ঞাপনে আসা নায়ক এক নিঃশ্বাসে স্ট্র দিয়ে taste করেই নিশ্চিত করে দেয় যে এ পানীয় একেবারেই সুরক্ষিত। গবেষণা রিপোর্ট এক ফুৎকারে হারিয়ে যায়। এইভাবেই বিজ্ঞাপনের মধ্য দিয়ে তৈরি হয় পণ্যসাম্রাজ্য যা আমাদের মনোজগতকে সম্পূর্ণভাবে অধিকৃত করে আমাদের এক নতুন বিশ্বের মধ্যে অনুপ্রবেশ ঘটায়।

(৪)

বিজ্ঞাপনের রঙিন চিত্রণ আপন যাপন সংস্কৃতির বাত্যয় ঘটিয়ে এক আনন্দপূর্ণ হ্যালোসিনেশনের ঝিমধরা অনুভূতির সঞ্চার করে, বোকাবাক্সের প্রতারণায় 'আদর্শ আমি'কে সন্ধান করতে করতে বিস্মৃত হয় 'প্রকৃত আমি'-র সন্ধান– অকস্মাৎ কোনো এক বিবেকের ভূমিকা এসে জানান দেয় আমাদের এই রূপান্তর, তারপর একটি ছোট্ট 'কী জানি' প্রশ্ন, যার উত্তরের সন্ধান করবার মতো মানসিক স্পৃহাও হারিয়ে যায় সহজিয়া জীবনের অনিবার্য প্রকল্পনায়, সেই বাস্তবপ্রহত জীবনের জলছবি বিচ্ছুরিত হয়েছে কথাসাহিত্যের মননের আরশিতে। আর সেই স্বচ্ছ দর্পণে সময়ের, সমাজের, ব্যক্তির যে রূপ-বদলের ইতিবৃত্ত, সংবৃত ফেনিলোচ্ছ্বসিত জীবনের অন্তরালবর্তী অস্থিপঞ্জরে থাকা 'সাদা ঘুণ' আমাদের চৈতন্যগোচরে এনে আমাদের উপহার দেয় এক বুদ্ধিবৃত্তিক অস্বস্তি। স্যাম্পেল, ডেমোর ছদ্মবেশ অতিক্রমণ পূর্বক এই কথাশিল্প হয়তো অনিঃশেষ ভোগ্যদৌড়ের মাঝখানে এক-একটি হার্ডেল হয়ে দাঁড়ায়, গতির নেশাকে প্রতিহত না করলেও খানিকটা ওই আয়নার মুখোমুখি করতে বাধ্য করায়।

সুব্রত সেনগুপ্তের লেখা 'কী জানি' (পরিচয়, শারদীয় ১৪০০) গল্পের কেন্দ্রে রয়েছে একটি প্রেম(?), যার হৃদয়ের উচ্ছ্বাস অব্যক্ত থেকে গেছে পণ্যের উন্মাদনায়। অফিসে সদ্য চাকরি পাওয়া যুবতী কিচুকে দেখে কথকের মনে হলো–

> "ম্যাগাজিনের বিজ্ঞাপনে, টি.ভির বিজ্ঞাপনে যে-রকম মেয়েদের দেখা যায় ও তাদের মতো!"[৫]

লক্ষণীয় যে আমাদের সৌন্দর্য অনুভূতির মধ্যে যে অবাধ কল্পনার অনুরণন, সহজ বিজ্ঞাপনের মডেল আমাদের মস্তিষ্কে খেলা করে ঠিক তাদের প্রতিই এক কুহকী অন্বেষণে ধাবিত করে। তাই 'চোখের আলোয় দেখেছিলেম চোখের বাহিরে' এ শতাব্দীর অনুভূতিহীনতায় হয়েছে 'ওরম তাকিও না, আমি ক্যাবলা হয়ে যাই'। আপন বিস্ময়কে ভাষারূপ দিতে এই স্মার্ট শতাব্দী 'ক্যাবলা'র থেকে বেশি কিছু হতে পারেনি। ফলত, আসল বসন্তকে হারিয়ে নকল বসন্তের কোকিল হয়ে আকাঙ্ক্ষার পণ্যবিশ্বকে ক্রমাগত আহ্বান বা আবাহন করে চলেছি। তাই কিচুর সাথে কথক আলাপ জমানোর উপায় পায় বিশেষ চকলেট কোম্পানির মনোগ্রাহী বিজ্ঞাপন দেখে। যেখানে একটি ছেলে একটি সুন্দরী মেয়ের সাথে বন্ধুত্ব করে দুইবার ব্যর্থ হয়ে সেই বিশেষ কোম্পানির চকলেট মেয়েটির হাতে তুলে দিয়ে বলে, 'আমার সাথে বন্ধুত্ব করবে?' মেয়েটিও এক ভুবন ভোলানো হাসিতে তার সুন্দর হাতখানি দিয়ে ছেলেটির হাত ধরে। অকৃত্রিম বন্ধুত্বের বদলে এই বিজ্ঞাপনী বন্ধুত্বই আদর্শ হয় কথকের কাছে। পণ্যের সম্মোহনগ্রস্ত মেয়েটির সঙ্গে যতোই নিবিড় হয় তার সম্পর্ক ততোই বদলে যায় তার পরিপার্শ্ব। লেখকের কথায়–

> "কিচু বিজ্ঞাপন দেখে এসে আমাকে জানিয়ে দেয়। এইভাবে পাল্টে গেল আমার বাড়ির বসার ঘর শোয়ার ঘর যায় বাথরুম। পাল্টে গেল আমার জুতো-মোজা-জামা। এমনকি যাকে অন্তর্বাস বলে সেই গেঞ্জি ইত্যাদি। পাল্টে গেল আমার চুলের-গোঁফের ছাট জুলপির কাট। পাল্টে গেল ব্যবহারের জিনিসপত্র। ব্যবহারের তালিকাও বেড়ে গেল। আমার হাঁটা-চলা-দাঁড়ানোর ভঙ্গি কথা বলার ধরণ। আমার মুখের ভাষাও পাল্টে গেছে। নতুন এই ভাষার নাম হিংলিশ-কিছুটা ইংরেজি কিছুটা হিন্দি। বিজ্ঞাপন জিন্দাবাদ।"[৬]

লেখকের এই সংক্ষিপ্ত বর্ণনাতেই স্পষ্ট, আমাদের যাপন অভ্যাসে বিজ্ঞাপনের পথ ধরে এই সীমাহীন পণ্যপ্রাচুর্য কেমন নাগপাশের মতো বিস্তার করে। বহুবিধ রোমহর্ষক পণ্যদ্রব্যের মধ্যে বাস করে এবং তার নিরন্তর ভোক্তারূপে ব্যবহৃত হতে হতে তারা নিজেই পরিণত হয়ে যায় পণ্যে—

> "আমাদের পণ্যদ্রব্যে পরিণত করে ভেতরে ভেতরে আমাদের ভাসমান, নিরালম্ব এবং যাবতীয় বর্জ্যবস্তুর অসহায় গ্রহীতা করে দিয়েছে।"[৭]

একটি ঠাণ্ডা পানীয়ের ব্যবহৃত বিজ্ঞাপনী ভাষাতেই এই অবস্থাকে স্পষ্ট করা যায়– 'ইয়ে দিল মাঙ্গে মোর'। পুঁজি তার আসল এজেণ্ডাকে এতো স্পষ্ট বা বলিষ্ঠভাবে সোচ্চার উচ্চারণে একটিমাত্র বাক্যে ইতিপূর্বে জানান দিয়েছে বলে আর জানা নেই। আর এই More বা আরো আমাদের 'মোর' বা আমার অস্তিত্বের সঙ্গে অবিমিশ্র অবস্থানে বিরাজমান, তার ভাষা, উচ্চারণ এবং বার্তা সব সমেত।

এমনই এক নকল বাস্তবতা বা জাঁ বদ্রিলার ভাষায় 'হাইপার রিয়ালিটি' থেকে কথকের বন্ধু পরিতোষ যেন কথকেরই বিবেক হয়ে কথকের এই বদলকে তীক্ষ্ণ ভাষায় দেখিয়ে চলেছে। তার মিশ্র ভাষার উদ্ভট উচ্চারণকে 'বাঁদরের ভাষা', তার সাজসজ্জাকে দেখিয়ে বারংবার বলেছে "তুই আর মানুষ নেই ঐ পুতুল হয়ে গেছিস।"[৮] বাড়ি গিয়ে টেলিভিশন না খুলে কথকের আয়নার সামনে দাঁড়ানো হয়তো সেই সত্যেরই মুখোমুখি হওয়া। কিন্তু এ বিবেকী প্রতিবাদও কতোটাই বা আলোড়ন আনে। নকল বাস্তবের মেকি শুশ্রূষায় তাই মনে ফের প্রশ্ন আসে— "নিজেকে দেখার ব্যাপারে কোনো বিজ্ঞাপনদাতা আমাকে সাহায্য করতে পারবে? কে জানে।"[৯]

রমানাথ রায়ের '৩৬-২৪-৩৬' গল্পতেও উঠে আসে সেই হাইপার রিয়েলিটির যান্ত্রিক যাপনের আখ্যান। গল্পের নায়িকা রুমি যেন জীবনের সকল মৌলিকতাকে সঃবৃত করেছে পণ্যদ্রব্যের আচ্ছাদনে। এ গল্প দেখায় যে বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে পুঁজি কেবল ভোগ্যপণ্যের প্রতি মানবহৃদয়কে আকৃষ্ট করেই থেমে থাকে না, বরং সৌন্দর্যের মাপকাঠি বা প্রমাণ বা আদর্শমান কত, সেটিও তাদের দ্বারাই নির্ণীত হবে। নারীদেহের সেই আদর্শমানই যেন এই ৩৬-২৪-৩৬। এই গড়নই যেন তাদের বিশ্বজয়ী করে তোলে, দুর্নিবার গতিতে চরম আভিজাত্যে তারা এগিয়ে চলে দুনিয়া জিততে। অন্যান্য গুণাগুণ সেখানে অপাংক্তেয়, অনাবশ্যক। মনে আসে, একটি বিশেষ ফেসক্রিম কোম্পানির বিজ্ঞাপনের কথা। নারীর ক্ষমতায়নের বার্তার অন্তরালে যেখানে চিহ্নিত ছিল পুঁজি নির্ণীত সুন্দরের ক্ষমতায়ন। একটি কালো মেয়ে সবদিক থেকে পরিত্যাজ্য, প্রত্যাখ্যাত হয়ে চলেছে গাত্রবর্ণের কারণে। তারপরেই সেই ক্রীম ব্যবহারে মাত্র দুই মাসে তার স্কিনটোন নাম্বার উপরের দিকে উঠে আসে, আর তারই সাথে পাল্লা দিয়ে উন্নতি হতে থাকে তার আত্মবিশ্বাস, মর্যাদা, সামাজিক সম্মান, স্বীকৃতি। অর্থাৎ ফর্সা হয়ে ওঠাই এককথায় মূলমন্ত্র। রমানাথ রায়ের গল্পের রুমিও ঠিক দুইমাসেই তার চেহারাকে ৩৬-২৪-৩৬ করে তুলেছে। সেই সাফল্যে সে এবং তার প্রেমিক উচ্ছ্বসিত। শুধু তাই ই নয়, তার অবয়বের প্রতিটি রূপান্তরের মূলেই যেন রয়েছে কোনো না কোনো প্রোডাক্টের অবদান। পরম আনন্দে সে প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর দেয় এরকম–

"রুমি আবার দাঁত বের করে হাসল। তার সাদা ঝকঝকে দাঁত দেখতে পেলাম।
-তোমার দাঁত এত সুন্দর হল কি করে?
-এর কারণ নিউ ম্যাকলিনস্। ম্যাকলিনস্ ফ্রেশমিন্ট দাঁত সাদা আর শক্ত করে তোলে।
-তোমার চুল এত সুন্দর হল কি করে?
-ক্যান্থারাইডিন ব্যবহার করে। ক্যান্থারাইডিন কেশতৈল কেশরাশিকে এক উদ্দাম রূপলাবণ্যে ভরিয়ে দিতে পারে।
-তোমার মুখ এত চকচক করছে কেন?
-ল্যাকমে ফেস পাউডার মেখে।
-তোমার গা এত সুন্দর হল কি করে?
-তুহিনা বিউটি মিল্ক মেখে। ল্যানোলিন ও ময়শ্চারাইজার মেশানো তুহিনা ভালভাবে মুখ ও গা-হাত-পা ফাটা বন্ধ করে, সারা শরীরে এনে দেয় স্নিগ্ধ কমনীয়তা।
-তোমার গা থেকে কিসের গন্ধ বেরোচ্ছে?
-লাক্স-এর। লাক্স-এর সবই ভাল কত মোলায়েম, কত খাঁটি, কত মিষ্টি গন্ধ!"[১০]

পণ্য এখানে কেবল ভোগ্যবস্তু হয়েই সীমাবদ্ধ থাকেনি তা যেন কেড়ে নিয়েছে আমাদের ভাষা–সাধারণ, স্বাভাবিক উচ্চারণ। আমাদের যাপনবিশ্বাসের গহীন অতলে বিজ্ঞাপনী শব্দ, বাক্য, ভাষায় ঢেকে গেছে যাবতীয় অস্তিত্ব। যে নকল বাস্তবের মেকি শুশ্রূষার কথা পূর্বে উল্লেখ করলাম, সেই হাইপার রিয়েলিটির নায়কও তাই রুমিকে নিয়ে ঘুরতে নিজেকে প্রস্তুত করে গোয়ালিয়র কাপড়ের প্যান্ট, বণ্ডসের শার্ট, বাটার উইকেণ্ড, চুলে বিলক্রিম এবং মুখটি টার্কিশ টাওয়েলে ভালো করে মুছে পরিপাটি হয়ে। তাদের গন্তব্য এয়ার কণ্ডিশনড মার্কেট। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত সেই কক্ষে সকলই শীতল, মার্জিত, সুগন্ধে ভরপুর। কিন্তু আশ্চর্যজনক, সেখানে সামনে পিছনে, ডাইনে বায়ে সকলেই ৩৬-২৪-৩৬। সকলেই যেন রুমি। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, মৌলিকতাকে যূপকাষ্ঠে বিসর্জিত করে সকলেই যে হয়ে উঠেছে বিজ্ঞাপনের সেই প্রমাণ মানেই। তাই পণ্যসর্বস্ব রুমি যেন কথকের চোখে শেষ অবধি হয়ে ওঠে সেই শোকেসে সাজানো ম্যানিকুইন—

"ঐ ত রুমি। রুমি শোকেসের ভিতর দাঁড়িয়ে আছে। গায়ে ব্লাউজ নেই, শাড়ি নেই। শুধু ব্রা আর প্যান্টিজ পরে দাঁড়িয়ে আছে। শোকেসের সামনে বেশ ভিড় জমে গেছে। ভিড় ঠেলে আমি দোকানের ভিতর ঢুকে পড়লাম।

রাগে শরীর কাঁপছিল। বেশ জোরেই ডাক দিলাম:

-রুমি! বেরিয়ে এসো।

রুমি বেরোল না। কাঁধে ব্রার স্ট্যাপে বুড়ো আঙুল ঢুকিয়ে বলল:

-Peter Pan: a new kind of bra."[১১]

আসলে সম্মোহিত জীবন ও সমাজ আমাদের কাছে ক্রমশ লস এনজেলেসের বোনাভেঞ্চার হোটেলের রূপ ধারণ করেছে, যেখানে প্রবেশমাত্রই মানুষ বিহ্বল ও হতচকিত হয়ে পড়ে, কোথাও প্রস্থানপথ না পেয়ে বিভ্রান্তের মতো কেন্দ্রবিহীন ভ্রাম্যমাণ সত্তায় রূপান্তরিত হয়। পুঁজিবাদের এই পিঞ্জরে ইন্দ্রিয়সুখভোগ্যতা এমনই, হাড়ের ভিতর দিয়া মানবজীবনের মরমে পশিল, যে অসুখের প্রতিষেধক নেই।

গত শতাব্দীর আট ও নয়ের দশক থেকে মধ্যবিত্ত, নিম্ন মধ্যবিত্তের ঘরে ঘরে যে পণ্যদ্রব্য এক নব্য সংস্কৃতির নির্মাণ করে তা হলো টেলিভিশন। ১৯৯১ এর ২৪শে জুলাই তদানীন্তন অর্থমন্ত্রী ড: মনমোহন সিং বাজেটে দেশের ভগ্ন অর্থনীতিকে উজ্জীবিত করতে অর্থনৈতিক উদারীকরণের প্রতিষেধকের ঘোষণার মধ্য দিয়ে ভারতের বাজার অবাধ বিদেশি বিনিয়োগের মধ্যবর্তিতায় টেলিভিশনের বাজার জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়ার কোম্পানিতে ছেয়ে গেল, মধ্যবিত্তের কাছে তুলনামূলক সহজলভ্য হলো, ১৯৯৪ সালে পঞ্চম বেতন কমিশনে সরকারি কর্মীদের বেতনকাঠামোয় অনেকখানি বদল এলো। অন্যদিকে ১৯৮৪ সালে হিন্দি দূরদর্শনে শুরু হলো ধারাবাহিক, ১৯৮৭ সালে বাংলায় প্রথম ধারাবাহিক 'তের পার্বণ' এর সূচনা, একই বছরে হিন্দিতে 'রামায়ণ' ধারাবাহিকের আরম্ভ এবং ব্যাপক জনপ্রিয়তা, ১৯৮৩ তে কপিল দেবের নেতৃত্বে ভারতের বিশ্বকাপ জয় এবং ১৯৮২-৯০ পর্যায়ে মারাদোনার ফুটবল জাদুতে বিশ্ববাসীর মুগ্ধতা ক্রমশই চাক্ষুষ করবার বাসনাকে তীব্রতর করে তোলে। টেলিভিশনের ঘরে ঘরে অনুপ্রবেশ বিজ্ঞাপন এবং পণ্যসংস্কৃতিকেও এক ভিন্ন মাত্রা এনে দেয়। জলের অপর নাম জীবন তাই টেলিভিশনের হাত ধরে সত্যই 'জীবন মানে জি বাংলা' হয়ে ওঠে দ্রুততার সঙ্গে।

রমানাথ রায়ের 'রঙিন টিভি' গল্পে প্রতিফলিত হয়েছে টেলিভিশন কেন্দ্রিক এক নব্য সংস্কৃতির কথা। গল্পের প্রসঙ্গে আসবার আগে একটু স্মরণ করে নেওয়া যাক একটি টেলিভিশন কোম্পানির পুরাতন বিজ্ঞাপনকে। যে বিজ্ঞাপনে মানুষের ঈর্ষাকে ব্যবহার করা হয়েছে বাণিজ্য বিস্তারের উপায় হিসাবে। আমাদের যাপনে প্রতিমুহূর্তে যে Superiority Complex আমাদের পরিতৃপ্ত করে তাকেই উস্কিয়ে দিয়ে একদা বিখ্যাত সেই কোম্পানি বিজ্ঞাপনের ট্যাগলাইন করে "পড়শীর ঈর্ষা/আপনার গর্ব।" মানুষের মধ্যে এই ঈর্ষা বা Superiority Complex এর সঙ্গে সমসময়ের অর্থনৈতিক টানাপোড়েনকে চমৎকারভাবে মিশ্রিত করে রমানাথ এই গল্পের বাচন নির্মাণ করেছেন। গল্পের কথক সময়ের ইশারায় সাড়া দিয়ে একটি সাদাকালো টিভি কেনে। খেলা, বিনোদন, গান, সমাচার, ধারাবাহিকে এক তৃপ্ত আবহ তৈরি হয় ঘরে। কিন্তু কর্মজীবনে সেই টিভি কেনার সগর্ব ঘোষণা করবার সময়তেই কথক অনুভব করে "যাদের রঙিন টিভি আছে তারা আমাকে অবজ্ঞা করে।"[১২] কিন্তু মধ্যবিত্তের সাদাকালো সংসারে রঙিন টিভি মানাবেই বা কীভাবে। তাই অফিস লোন নিয়ে ঘর রঙ করা, ড্রয়িং রুম নির্মাণ, নতুন সোফা সেট, পর্দা, ডিভানে দামী চাদর সব ব্যবস্থা করা হলো। দশ হাজার টাকা মূল্য দিয়ে আনা হলো রঙিন টিভি। কিন্তু তবুও যেন থেকে গেল এক অতৃপ্তি। সে লক্ষ করলো অফিসে যাদের রঙিন টিভি আছে, তাদের টেলিফোন আছে,গাড়ি আছে, তারা দেখতে সুন্দর, ভালো খায়, ভালো চাকরি করে। টিভি ওয়ালা বন্ধুদের সাথে ক্রমশই যেন তার দূরত্ব তৈরি হয়, সে অনুসন্ধান করতে থাকে টিভি হীন বন্ধুর। সে সংখ্যাও

প্রতিনিয়ত কমে আসে এবং তারাও কোনো না কোনো প্রতিবেশীর বাড়ি টিভি-ই দেখতে যায়। ফলত, কথক সম্পূর্ণ একা হয়ে যায় এবং অসহ্য হয়ে যায় এই টেলিভিশন। দুদিন পর তার মা অসুস্থ হলে সেই দশ হাজারের টিভি পাঁচ হাজার টাকায় বিক্রি করেই চিকিৎসা হয়। সুস্থ হয়ে এলেও প্রিয় টিভির অনুপস্থিতিতে বিমর্ষ মা এর অচিরেই মৃত্যু ঘটে, মা এর শোকেই কিছু পরেই বাবাও পরলোক গমন করে। এমন চরম সময় যখন কথকও একাকিত্বের যন্ত্রণা থেকে মুক্ত হতে আত্মহননের চিন্তা করে, তারপরই তার স্মরণে আসে বাবা ও তার নামে থাকা কিষাণ বিকাশের দেড় লাখি কাগজের কথা। সে টাকায় তার রঙিন টিভি, স্কুটার, টেলিফোন এবং 'অভিজাত ঘরের সুন্দরী পাত্রীর বিজ্ঞাপন' সহযোগে এক নবজীবনের সূচনা হয়।

আইওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ অফ মেডিসিনের নইউরোকেমিস্ট্রির প্রধান আন্তনিও দামাশিও রচিত 'দেকার্তস এরর: ইমোশন রিজন এণ্ড দ্য হিউম্যান ব্রেন' নামক গ্রন্থে এলিয়ট নামে এক যুবকের কেস স্টাডিতে উঠে আসে এক অদ্ভুত নির্লিপ্ত ও উদাসীন মনোভাবের কথা। পৃথিবীর যাবতীয় প্রস্তাবনায় তার হৃদয় বা মনের উপর কোনো প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে না। ভূকম্প বিধ্বস্ত বাড়ি, অগ্নিদগ্ধ মানুষ, বন্যায় ভেসে আসা শিশু সব কিছু দেখেও সে নিরুত্তাপ, ভাবলেশহীন। সামাজিক যাপনের মধ্যে থেকেও এলিয়টের প্রধান সমস্যা– "to know but not to feel"। অথচ তার IQ স্কোর সব সময়ই স্বাভাবিক মানুষেরই মতো। এই কেস স্টাডি যেন শুধুমাত্র এক সমাজবিচ্ছিন্ন ব্যক্তিবিশেষের ঘটনা নয়, বিশ্বায়ন তথা বাজার অর্থনীতির যুগে আমরা প্রত্যেকেই যেন এক এক জন এলিয়ট।

প্রজন্মের এই অচরিতার্থতা, সময়ের অসুখকেই কাজে লাগিয়ে নিত্যনতুন পণ্যবিশ্ব আমাদের আত্মকেন্দ্রিক মনোভাবকে যেমন বাড়িয়ে চলছে অন্যদিকে আমাদের সেখানে আত্মবিক্রয়ের কৃতকৌশল। আজকের যুগে তাই যেকোনো কিছুই 'প্রোডাক্ট' এবং বিক্রয়যোগ্য। স্বপ্নময় চক্রবর্তীর লেখা 'যে মেয়েটি মোহময়ী হতে চেয়েছিল' (পরিকথা, ডিসেম্বর, ১৯৯৯) গল্পে সোনালী গড়াই নামে একজন বিশ বছরের যুবতীর অপ্রাপ্তি এবং সামাজিক মানদণ্ডে 'মোহময়ী' না হওয়ার হৃদয়ের দুর্বলতার রন্ধ্রপথ ধরে বিজ্ঞাপনী ও পণ্যপ্রলোভন এবং পরিণামে জীবনের অকালবিনষ্টির দুর্ভাগ্যের আখ্যান উঠে এসেছে। আমাদের সমাজ প্রতিটি মানুষকে, বিশেষত নারীকে ওই ৩৬-২৪-৩৬ এর মতোই একটি 'মোহময়ী' মানদণ্ডে বিচার করতে জানে। আর সে পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ হওয়া মানেই সে সর্বক্ষেত্রে প্রত্যাখ্যাত এবং ব্যাঙ্গের শিকার। তাই পাড়ার ছেলেদের সোনালীকে দেখলেই মনে আসে 'নিমাই', 'ম্যাঞ্চেস্টার' মতো শব্দ, যার মধ্যে লুকিয়ে থাকে গভীর কুৎসিত ব্যঞ্জনা। সোনালীর মানসসৃষ্ট সমাজ আরোপিত এক হীনমন্যতার চোরাপথ ধরেই প্রবিষ্ট হয় বিজ্ঞাপন–

> "কলেজের দু-একটি মেয়ে মেয়েদের পত্রিকা রাখে। ওগুলোতে মাঝে মাঝে মোহময়ী হয়ে ওঠার কথা পড়েছে সোনালি। 'পুরুষের কাছে আরও আকর্ষণীয় হয়ে উঠুন' পড়েছে।... কিছুদিন পরে আর একটা সংখ্যা বেরোয়, স্তন সংখ্যা। সোনালি কিনে নেয়।...লুকিয়ে লুকিয়ে একটু একটু পড়ে। কান লাল হয়, তেষ্টা পায়। চোখে পড়ে খাজুরাহোর পাথরমূর্তির ছবির তলায় লেখা স্তনই নারীর সম্পদ। তারপর একটা বিজ্ঞাপন। স্তন সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য গ্লান্ডিনার।"[১৪]

এই গ্লান্ডিনারই সোনালীর অন্তিম আশ্রয়, 'মোহময়ী' হয়ে ওঠার চাবিকাঠি। আর সেই সুযোগেই এই মোহময়ীর টোপ দিয়ে তাকে আত্মসাৎ করে নেয় দোকানের মালিক। যার সমাপ্তি হয় মৃত্যুতে–

> "গণপতি মন্ডল মেয়েটির নাড়িতে আঙুল রাখে। চোখ বোজে। মেয়েটার জড়ানো কথা শোনা যায়, আমাকে বাঁচান, আর কখনও চাইব না। একটা মাছি গরীব স্তনবৃন্তের উপরে চুপচাপ বসে যায়..."[১৫]

'গরীব স্তন' এর অধিকারিণী মেয়েটির 'মোহময়ী' হওয়া হলো না আর অন্যদিকে "রমনীয় পত্রিকাটি বিজ্ঞাপনে জানাল পরবর্তী সংখ্যার কভার স্টোরি-অস্বাভাবিক যৌন মনস্তত্ত্ব"[১৬]

বিশ্বায়িত পুঁজি বিস্ফোরণের কালে যেকোনো দ্রব্যই বিক্রয়যোগ্য এবং এই বিক্রয়, বিক্রয়ের প্রলোভন মানবিক মূল্যবোধ ও প্রগতিশীল চিন্তাকে সম্পূর্ণ রূপে বিসর্জিত করে উচ্চাশার মিনার নির্মাণই একমাত্র লক্ষ্যতে পরিণত হয়েছে। আমাদের এ পর্বের আলোচনা সমাপ্ত করবো গৌর বৈরাগীর লেখা 'ক্যামেরা' (অনুষ্টুপ, শারদীয় ১৪০৫) গল্পের মধ্য দিয়ে। অনিমেষ তথা ভূটান নামের এক যুবক কর্মসূত্রে প্রবেশ করেছে একটি বহুজাতক সংস্থায় সেলস এক্সজিকিউটিভ হিসাবে। দারিদ্র্যক্লিষ্ট জীবন থেকে উঠে এসে সেলস, টার্গেট, গ্রোথ এর বিশালাকার ফীগার যেন চমকে দেয় তাকে। বিস্ময় সহযোগে সিনিয়র দত্তদার থেকে শোনে–

> "দুই হাজার সালে দু'হাজার কোটী টাকার পাউডার খরচ করবে ভারতবর্ষ। টোটাল মার্কেটের ওয়ান ফোর্থ ক্যাপচার করবে আমাদের কোম্পানি।"[১৭]

ভূটানের মনে আসে এক কেজি আলুতে তার তিনদিনের সংসার চলে। চাকরির কিছু মাস পরে শখ বশত ভূটান একটি ক্যামেরা কেনে, যার হিসেবি রিলে নির্দিষ্ট হয় উনুন জ্বালিয়ে রান্না করা মা, রোগজীর্ণ মাসি, পুরাতন ভগ্নপ্রায় বাড়ি 'কনক-স্মৃতি' এবং এই কম আলোর অন্ধকার প্রায় ছবির মধ্যেই যেটুকু আলো, উজ্জ্বলতা তা প্রেমিকা বনির ব্যানার্জি কেবিনে তোলা ছবি। ছবি ওয়াশের পর বনির চুলের লাল গোলাপ যেন হয়ে যায় প্রায় কালো। ছবির এই অন্ধকার যেন ভূটানের যাপিত জীবন বাস্তবতাকেই ফ্রেম বন্দি করেছে। কিন্তু কোম্পানির কাছে এ ছবি নিতান্তই তার অদক্ষ হাত। তাদের কাছে কেবলমাত্র সত্য রূপে দেখা দিল একটাই ছবি। যেখানে কোলে সন্তান নিয়ে একটি মা, দোকান থেকে কিনছে তাদের কোম্পানিরই টুথব্রাশ। সেলস স্ট্রিপস আর অবলারের রঙিন সাজে ঝলমল করছে ছবির পশ্চাৎপট। একমাত্র এই কৃত্রিম ছবিটাই কোম্পানির ম্যানেজারের নজরে হয়ে ওঠে 'রিয়েল স্টোরি এফেক্ট'। ভুটানের এই ছবি চলে যাবে ব্যানারে, হোডিং এ। প্রকাশ পাবে খবরের কাগজের বড় পাতা জুড়ে। দেশের কাছে বার্তা যাবে কীভাবে দীনমজুর, কৃষকের পরিবারে পৌঁছে যাচ্ছে কোম্পানির ব্রাশ। যে ব্রাশের ঝকঝকে মায়াবী আলোয় কেটে যাবে নাকি সামাজিক সকল অন্ধকার। কর্পোরেট আমাদের দেখাবেই 'ফীল গুড'। অন্ধকারে থাকা জীবনের কোনো ডেটাবেস থাকে না, কিন্তু এ ছবি তো মিথ্যে বলে না। এই হাসিখুশি ছবিতেই ভূমি উচ্ছেদ থেকে শুরু করে অরণ্য উচ্ছেদ, আদিবাসীদের বাস্তুচ্যুত করে প্রাকৃতিক সম্পদের দখলের মধ্য দিয়ে গড়ে তোলা কর্পোরেট সাম্রাজ্য শক্ত ভিতে সুপ্রতিষ্ঠিত হবে।

(৫)

বিশ শতকের শেষ থেকে একুশ শতকে এ.আই যুগে এসে আমরা আরো স্পষ্টতরভাবে অনুধ্যান করতে পারি বিশ্বায়নের হাত ধরে পণ্যসংস্কৃতির অলীক প্রকল্পনা ক্রমশ ঘিরে ফেলেছে আমাদের স্বাভাবিক জীবনের নব নব অঙ্কুরিত বীজভূমিকে। সাইবারস্পেসে অনিকেত ভাসমান জীবন কোনো বিশেষ দর্শনে নোঙর ফেলতে পারছে না। পণ্যবিশ্বের কোলাহলে নিরুচ্চার থেকে যায় যাপিত জীবনের গ্লানি, অসন্তোষ, অপ্রাপ্তির বেদনা। ১৯৯০-এর পরবর্তী ভারতের নাগরিক সমাজে কর্পোরেট ধনতন্ত্র এবং তার নয়া-উদারনৈতিক আধিপত্য আজ ভালোভাবেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে মনোজগতে। সীমাহীন অর্থনৈতিক সম্পদের লোভ সৃষ্টি করেছে এক তীব্র প্রতিযোগিতার। মানবিক মূল্যবোধ ও প্রগতিচেতনাকে বিসর্জিত করে সৃষ্টি হয়েছে উচ্চাশার গগনভেদী মিনার।

গ্রামশির মতে, শাসক শুধু বলপ্রয়োগের যন্ত্র দিয়ে শাসন করে না। তাঁর মতে, রাজনৈতিক সমাজ (Political Society) ছাড়াও রয়েছে এক নাগরিক সমাজ (Civil Society)।[১৮] এই নাগরিক সমাজ গড়ে উঠেছে অনেকগুলি স্বেচ্ছামূলক বেসরকারি সংগঠনকে নিয়ে। বিদ্যালয়, কলেজ, সংবাদপত্র, সাময়িকপত্র, বিতর্কসভা,

বিজ্ঞাপন সংস্থা প্রভৃতি তার উদাহরণ হিসাবে বলা যায়। এরা আপাত ভাবে মনে করে যে তারা স্বাধীন, স্বতঃস্ফূর্ত, স্বয়ংশাসিত সংস্থা বা সংগঠন। যেন সেখানে রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ নেই। গ্রামশি দেখালেন, নাগরিক সমাজের মধ্যে এই বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলির মাধ্যমে গড়ে ওঠে শাসকশ্রেণির মতাদর্শ ও সাংস্কৃতিক আধিপত্য। আর বিশ্বায়ন পর্বে যেখানে রাষ্ট্রের উপর রয়েছে পুঁজিবাদের সর্বব্যাপী বিস্তার সেখানে সুকৌশলে, নানান প্ররোচনায় প্রলোভনে যে বিজ্ঞাপনী ভাষ্যে অধিকাংশক্ষেত্রেই তাদের অনুকূল মূল্যবোধ, চেতনা, আদর্শের প্রচার থাকবে এটাই প্রত্যাশিত।

সমাজ সম্পৃক্ত লেখকের রচনায় তাই বিজ্ঞাপন ও পণ্যসংস্কৃতির এই আগ্রাসন যথার্থই গোচরীভূত হয়েছে। বিজ্ঞাপনের ভাষা যে শুধু পণ্যেরই বিবরণ দেয় না, তার অন্তরালে থাকা বার্তাগুলি কীভাবে সাধারণ জীবনের উপর প্রভাব বিস্তার করেছে তা উঠে এসেছে তাঁদের বাস্তবকল্প নির্মাণের মধ্য দিয়ে। মেক আপের তুলি যে ক্ষতকে স্পর্শ করতে পারে না, ঝকঝকে আলো যে অন্ধকারকে দূরীভূত করতে পারেনি অথবা চায়নি, সেই জগতেরই ইতিবৃত্ত উঠে এসেছে সেই সব রচনায়। পানের বদলে পানপরাগে স্বচ্ছন্দ বাঙালির যাপন বিবর্তনের অভিমুখটির মধ্যে যে অসংখ্য ভাবনার স্রোত, যে ভোগস্পৃহা, ড্রয়িং রুম সংস্কৃতি থেকে ভাষা সন্ত্রাস–সকল দিকই উঠে এসেছে নির্বাচিত গল্পের ভাষ্যে। শুধু নেই পরিত্রাণের কোনো স্বর। কারণ? 'ইয়ে দিল মাঙ্গে মোর'— এই উচ্চারণ ই বৃহত্তর সত্য হয়ে উঠেছে একুশ শতকের যাপনচিত্রণে।

তথ্যসূত্র:

১. চৌধুরী, প্রমথ। বীরবলের হালখাতা। কলকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ১৩২৪, পৃ. ১৯।

২. Presbrey, Frank. The History and Development of Advertising. New York, 1929, Doubleday, Doran & Company, P. 46.

৩. মুরসিদ, গোলাম। অষ্টাদশ শতাব্দীর বিজ্ঞপ্তি-বিজ্ঞাপনের ভাষা। দেশ, সাগরময় ঘোষ (সম্পা.), ১২ই সেপ্টেম্বর ১৯৮৭, পৃ. ৩০।

৪. চট্টোপাধ্যায়, অনির্বাণ। অনুদার কোলাহল, দেশ। সাগরময় ঘোষ (সম্পা.), ১৬ই জানুয়ারী ১৯৯৩, পৃ. ২৩।

৫. সেনগুপ্ত, সুব্রত। কী জানি, পরিচয়। অমিতাভ দাশগুপ্ত (সম্পা.), শারদীয় ১৯৯৩, পৃ. ২৫৬।

৬. সেনগুপ্ত, সুব্রত। তদেব, পৃ. ২৫৯।

৭. সেনমজুমদার, জহর। নিম্নবর্গের বিশ্বায়ন। কলকাতা, পুস্তক বিপণি, দ্বিতীয় মুদ্রণ, এপ্রিল ২০১৭, পৃ. ৭৯।

৮. সেনগুপ্ত, সুব্রত। তদেব, পৃ. ২৬১।

৯. সেনগুপ্ত, সুব্রত। তদেব ব, পৃ. ২৬১।

১০. রায়, রমানাথ। ৩৬-২৪-৩৬, গল্পসমগ্র (প্রথম খণ্ড)। কলকাতা, বাণীশিল্প, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ২০১৫, পৃ. ১৬৯।

১১. রায়, রমানাথ। তদেব, পৃ. ১৭১।

১২. রায়, রমানাথ। রঙিন টিভি, গল্পসমগ্র (প্রথম খণ্ড)। কলকাতা, বাণীশিল্প, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ২০১৫, পৃ. ১৫৬।

১৩. Damasio, R. Antonio. 'Descartes' Error: Emotion, Reason, and the Human Brain. New York, G.P. Putnam's Sons, 1994, P. 36-52.

১৪. চক্রবর্তী, স্বপ্নময়। যে মেয়েটি মোহময়ী হতে চেয়েছিল, পঞ্চাশটি গল্প। কলকাতা, আনন্দ, ২০১২, পৃ. ২০৭।

১৫. চক্রবর্তী, স্বপ্নময়। তদেব, পৃ. ২১১।

১৬. চক্রবর্তী, স্বপ্নময়। তদেব, পৃ. ২১৩।

১৭. বৈরাগী, গৌর। ক্যামেরা, অনুষ্টুপ। অনিল আচার্য (সম্পা.), প্রাক্-শারদীয় ১৪০৫, পৃ. ১৬৬।

১৮. বসু, প্রদীপ। ভারতীয় সমাজে মতাদর্শগত ও সাংস্কৃতিক আধিপত্য-র কয়েকটি প্রধান উপাদান, স্বরান্তর। দ্বিজেন্দ্র ভৌমিক (সম্পা.), জানুয়ারী-ডিসেম্বর ২০২৫, পৃ. ১১৬।